বিষ্ণু দে - (১৯০৯-১৯৮২)
- তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

'উর্বশী ও আর্টেমিস' বিষ্ণু-দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। শ্যামল রায় ছদ্মনামে তিনি কল্লোল, মহাকাল প্রভৃতি পত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখেছেন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' (১৯৩৮)। বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলি হল; নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩), পূর্বলেখ (১৯৪১) সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪) সন্দীপের চর (১৯৪৭) অন্বিষ্ট (১৯৫০), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩) ইত্যাদি। বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় রবি করোজ্জ্বল, নিজদেশে (১৯৭৬)

কবিতাটি 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা। এই কবিতায় বিষ্ণু দে-র রবীন্দ্র অনুরক্ত সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।

বিষ্ণু দে আত্মচেতনায় বারবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন। 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের নামটিও একটি রবীন্দ্র কবিতার পংক্তি। এই কাব্যের প্রথম কবিতা '২২শে শ্রাবণ' শেষ কবিতা ২৫শে বৈশাখ।

চারটি স্তবকে বিন্যস্ত এই কবিতার প্রথম দুটি স্তবকে কবি একের পর এক প্রশ্ন রেখেছেন। প্রথম স্তবকে চারটি ও দ্বিতীয় স্তবকে তিনটে প্রশ্ন রয়েছে। কবির জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ কি কেবল স্মৃতি, শুধু উপলক্ষ, হরেক উৎসবের হৈ হুল্লোড়, মঞ্চে মঞ্চে বিব্রত কবি ছবি ? তিনি কি শুধুই পঁচিশে বৈশাখ তবে ২২শে শ্রাবণ, কবির মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছবি নন, তিনি জীবনের ধ্রুবতারা; তিনি আমাদের 'প্রাণের দেবতা', তাঁর কবিতা-গান-সাহিত্যই পারে সব সংকটকে বিদূরিত করতে। তিনি ভারত আত্মার বাণী প্রচার করেছেন, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি শুধু স্মৃতিতে নয়; তিনি আমাদের সত্তায়।

সমস্ত জীবন রবীন্দ্রনাথ শুধু সত্যের উপাসনায় উৎসর্গ করেছেন। সমগ্র জীবনটাই তার জীবন্ত সাহিত্য। তাঁর বিশাল প্রতিভা সূর্যের প্রখর দীপ্তির সঙ্গে তুলনীয়। সেই দীপ্তিকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা

Scanned with CamScanner

বাঙালির সেই বহুদিনের গৌরবলতে যে তেজ ক্ষিয়মান হয়ে আসছে। তাই অসুন্দরের সাধনায় সে মেতে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মহৎ আদর্শের কথা বাঙালি ভুলে গেছে। সংকীর্ণ গণ্ডিতে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যে মানব জীবনের সার্থকতা নেই। সেখানে প্রতিনিয়ত ধুলো, ময়লা ম্লানই করে। সেখানে সুন্দরের পরিবর্তে অসুন্দর ভিড় করে।

সমস্ত জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ আশার গান শুনিয়েছেন। জাতির নৈরাশ্য মেটেছেন। সে জাতির অনুপম দীপ্তি বিশ্বকে করে তুলেছে মহাবিশ্ব। রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রার সাধনা। তাঁর সমস্ত জীবন ছিল চেতনার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। সুন্দরের সাধনা সত্যের সাধনা-ই ছিল তাঁর পথ। তাই এ কবিতায় 'বলাকা' কাব্যের গতির প্রসঙ্গ এসেছে।

জ্ঞানতাপস রবীন্দ্রনাথের আকাশেই কিছু যে মনে করেন বাঙালীর মুক্তি। সেই আকাশই কবি প্রার্থনা করেছেন, আমি বড়দের সুদীর্ঘ জীবনের নানা কীর্তি-ই পারে আমাদের উজ্জীবিত করতে। রবীন্দ্রনাথ ভারতকে করে তুলেছেন আমাদের গর্বের ভারতবর্ষ। রবীন্দ্রনাথের জীবন আর সৃষ্টিই পারে আমাদের এগিয়ে চলার পথকে আমাদের প্রশস্ত করতে।

কবির বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের অমোঘ মন্ত্র গীতিই ঘুমিয়ে থাকা জাতিকে জাগিয়ে তুলবে। আমাদের যাবতীয় দৈন্যের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, কুৎসিত আবর্জনা তখনই দূর হবে যখন রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দরের গান' আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু যে দৃশ্য পাঁচটার যাত্রী থেকে– বাংলার নতুন কলোনিতে, শুরু করে, বাসায়, বস্তিতে, সর্বত্রই শুনতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের জীবনের ধূসর ভিতে 'সুন্দরের গান।'

বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনি মাইকা আজ মানুষকে যেভাবে অসুস্থ করে '[illegible] তুলেছে' সেখান থেকেও মানুষকে মুক্ত হতে, সুস্থ করে তুলবে রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দরের গান।' সংস্কৃতি থেকে সৃষ্টি মূল্যবোধ বিচ্যুত হলে 'সংস্কৃতি' পরিণত হয় অপসংস্কৃতিতে। আর প্রগতির উন্নয়নের প্রতিভূ হবার থেকে প্রগতির সংস্কৃতিতে। তাই যিশুকে মনে করেন শুধু জন্মদিন আর মৃত্যুদিন পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবনের নামাবলী করতে হবে, সহমর্ম করতে হবে তার চিন্তাধারার, আদর্শ।

এই কবিতায় বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে বর্তমানের, ভবিষ্যতের বাঙালীর দিগ্‌ভ্রান্ত 'প্রতিদিনে'র করে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে আছে কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের শক্তি ও শান্তি, জীবনের স্বাধীনতা, নির্ভয়, সাহসী ও প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিবাদী হবার মন্ত্র। ঐশ্বর্য - মাধুর্য - ত্যাগ - সাধনা - সংকল্প সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ। তাই তাকে জীবনের 'ধ্রুবতারা' করে আমাদের আলোর পথযাত্রী হতে হবে। তিনি আমাদের 'জাতীয় বিবেক।'

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'রবীন্দ্র প্রতিভার উন্মোচনকারী'য় বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে আধুনিকেরা নিজেদের ও চিনতে পারবে না।'